কেন বঞ্চিত হব চরণে : রজনীকান্ত সেন

পূর্ণেন্দু বসু

বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার যুগসূচনা উনবিংশ শতাব্দীতে। তবে এর যথার্থ সমৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্র পর্বে। এর বিস্তৃতি ও বহুমুখীনতা বিস্ময়কর। রবীন্দ্র সমকালীন কয়েকজন কবির প্রতিভা মুখ্যত গীতিকার ও সুরকারের। কাব্যসংগীতের এই ধারার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করবার মতো। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের মধ্যে কবি, গীতিকার ও সুরকারের 'ত্রিবেণীসংগম' ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবসাধনার ক্ষেত্রে অনন্য — তাঁর রচনার বিশ্বজনীনতা এবং সুর ও বাণীর মণিকাঞ্চন যোগ অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথকে তাই আজকের আলোচনায় আনছি না। দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় রাগ-রাগিণীর পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংগীতকে বাংলা কাব্যসংগীতে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি একাধারে কবি ও নাট্যকার। জীবনের শেষ পর্বে তিনি নাটক রচনাতেই অধিক মনোনিবেশ করেছেন। ফলে সুপ্রযুক্ত বেশ কিছু গান তাঁর নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কবি অতুলপ্রসাদ মাত্র ২০৭টি গান রচনা করেছেন। রজনীকান্তের মুদ্রিত গানের সংখ্যা ৩২৩। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম বাণী (১৯০২), অমৃত (১৯১০), কল্যাণী (১৯০৫), অমৃত (১৯১০), সদ্ভবকুসুম (১৯১৩) ও শেষদান (১৯২০)। কবির সংগীতসমূহ সংকলিত হয়েছে 'বাণী', কল্যাণী,'আনন্দময়ী', 'অভয়া' ও 'শেষদান' কাব্যগ্রন্থে।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সহদেবপুর গ্রামে রজনীকান্তের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান। কবির প্রপিতামহ যোগিরাম সেন 'ভাঙাবাড়ি'র জমিদার যুগলকিশোর সেনগুপ্তের কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি পিতৃগৃহে ভ্রাতা শ্যামকিশোর সেনের আশ্রয়ে 'ভাঙাবাড়ি'তে আসেন। এখানেই তাঁর পিতামহ গোলকনাথ সেনের জন্ম। মাতুল শ্যামকিশোর গোলকনাথকে একটি বসতবাড়ি ও কিছু জমি দান করেন। অতি কষ্টে এখানেই তিনি জীবনযাপন করেন। সহদেবপুরের অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

গোলোকনাথের দুই পুত্র — গোবিন্দনাথ, ও গুরুপ্রসাদ। গোলকনাথ নিজে ঠিকমত লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। পুত্রদের তিনি যথাযথ ভাবে লেখাপড়া শেখান। রজনীকান্তের পিতৃদেব ছিলেন গুরুপ্রসাদ সেন। অগ্রজ গোবিন্দনাথ রংপুর কালেক্টরীর সেরেস্তাদার কাশীনাথ তালুকদারের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এই মৌলবীর নিকট তিনি ফারসী শেখেন। অনেক অধ্যবসায়ে তিনি উকিল হন। ওকালতিতে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। কিন্তু তিনি সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। রাজশাহিতে তিনি পঁচিশ-ত্রিশ জন ছাত্র ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন বেশ কয়েক বছর। গোলোকনাথের পুরাতন বাসস্থানেই তিনি দুই মহলা বাড়ি তৈরি করেন। বাংলা সাহিত্যের সুলেখিকা অম্বুজাসুন্দরী গোবিন্দনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী রাধারমণী দেবীর কন্যা।

গোবিন্দনাথের অনুজ গুরুপ্রসাদ ফারসি ও সংস্কৃতে দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরাজিতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। ঢাকা থেকে ওকালতি পাশ করে তিনি মুন্সেফ হন। কালনা, কাটোয়া, রঙপুর, দিনাজপুর, ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে তিনি কাজ করেছেন। কিছুকাল পরে তিনি বরিশালে সাব-জজ হন। পরে বদলী হন কৃষ্ণনগরে। কালনা-কাটোয়াতে অবস্থানের সময় তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। এই ভক্তি ও শাস্ত্রানুরাগের ফসল তাঁর মূল্যবান রচনা 'পদচিন্তামণিমালা' (১২৮৩)। তিনি খুবই সংগীতপ্রিয় ছিলেন। পিতার ভাবাবেশে পুত্র রজনীকান্ত মুগ্ধ হতেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি পিতার সঙ্গে কীর্তনের আসরে যোগ দিয়েছেন। শৈশবজীবন থেকেই শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃতে ও বাংলায় দ্রুত পদ্য রচনার শক্তি পরিলক্ষিত হয়। অল্প পাঠেই তাঁর স্মরণশক্তি কাজ করত। অসুস্থতাবশতঃ বি.এ পরীক্ষার জন্য তাঁর পাঠ এক বছর ব্যাহত হয়। বি.এ পাশের পর আইনও পাশ করেন। রাজশাহিতে জ্যাঠতুতো ভাই (বি.এল) বিদ্বান কালীকুমারের নিকট তিনি পাঠাভ্যাস করেন। এই সময়ে তিনি বাংলায় বেশ কিছু ছোট কবিতা রচনা করেন। কবির প্রথম কাব্যের প্রেরণাদাতা এই কালীকুমার। ওকালতিতে বরদাগোবিন্দের প্রভূত আয় ছিল। কালীকুমারের আয়ও নগণ্য নয়। বৃদ্ধ গোবিন্দনাথ তাই বরদাগোবিন্দের উপর বিষয়কর্মের ভার দিয়ে ভাঙাবাড়িতে ফিরে যান। রজনীকান্তের পিতৃদেব গুরুপ্রসাদ তখন বরিশালের সাব-জজ। সুখের এই সময়টিতে এই পরিবারে একে একে ঘোরতর বিপর্যয় নেমে আসে। হঠাৎ গুরুপ্রসাদ কৃষ্ণনগরে বদলী হন। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমারের অনুরোধে তিনি চাকুরী থেকে বিশ্রাম নিয়ে পেনশনভোগী হন। অকস্মাৎ কলেরা রোগে বরদাগোবিন্দের মৃত্যু ঘটে। নিদারুণ মর্মাঘাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কালীকুমারও দেহত্যাগ করেন। কৃতী আদর্শ দুই ভ্রাতার অকাল বিয়োগে গুরুপ্রসাদ মর্মাহত হন। অশীতিপর গোবিন্দনাথ কঠিন পুত্রশোক দমন করে

আত্মস্থ হবার চেষ্টা করেছেন। এমন সময় বরদাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র যকৃৎ-প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরে মাত্র এগারো বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করল। এই সময়ে আকস্মিকভাবে গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীনাথ কুকুর দংশনে জলাতঙ্ক রোগে মাত্র দশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। এই বালকের কমনীয় মূর্তি ও কবিতা রচনাশক্তি সকলকে মুগ্ধ করত। সেন পরিবারে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল।

রজনীকান্ত জিম্‌ন্যাস্টিক, খেলাধুলা, সাঁতারে পটু ছিলেন। প্রথম শ্রেণি থেকে এনট্রান্স পর্যন্ত তিনি প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। এই সময়ের সকল পরীক্ষাতেই ইংরাজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ অংশগুলি তিনি গদ্যের পরিবর্তে পদ্যে রচনা করেছেন। গল্প বলার তাঁর এক আশ্চর্য শক্তি ছিল। কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে এলেই তাঁকে ঘিরে বসত গল্পের আসর। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সংগীত-অনুরাগ ছিল প্রবল। কোনও গানের আসরে গান শুনে বাড়িতে সে গান শুনিয়েছেন অনেক সময়েই। কিন্তু নিজে গান রচনা করে সেই গান গাইতেই তিনি বেশি আনন্দ লাভ করতেন।

রজনীকান্তকে রাজশাহির উৎসবরাজ আখ্যা দেওয়া হ'ত। দীঘাপাতিয়ার শরৎকুমার রায়কে একসময় তিনি লেখেন,

> কুমার আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসা করিতে পারি নাই। কোন দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

ওকালতিতে যখন রজনীকান্তের পসার একটু ভাল, সেই সময়ে তাঁর তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কবির হৃদয়ে কঠিন আঘাত। জীবনীকার নলিনীরঞ্জন লিখেছেন, "বুক দমিল, তবু মুখ ফুটিল না। ভগবদ্‌বিশ্বাসী কবি নীরবে এই শোক কেবল জয় করেননি। পুত্রের মৃত্যুর পরদিন শোকদগ্ধ হৃদয়ে লিখলেন অসাধারণ একটি গান,

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া সুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।

এরপর কবি নাটোর ও নওগাঁতে অস্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ওকালতিতে ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকায় তিনি সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেননি। নম্র প্রচারবিমুখ কবি যে সমালোচকের ভয়ে গ্রন্থ প্রকাশে ইতস্ততঃ করেছেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁকেই আমন্ত্রণ করে আনেন জলধর সেনের গৃহে। সেখানে কবির গান শুনে তিনি নিজেই তাঁর গানগুলি ছাপাবার প্রস্তাব করেন। অক্ষয়কুমারের উপর কবি গানগুলির নামকরণ ও গ্রন্থ প্রকাশের সকল ভার অর্পণ করেন। অক্ষয়কুমারের বহু পরিশ্রমে কবির গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। কবির গ্রন্থ 'বাণী' ও 'কল্যাণী' বিশেষরূপে সমাদৃত হয়। রজনীকান্ত সেন রচিত গ্রন্থের সংখ্যা আট। কবির মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী'(১৯০৫),

'অমৃত' (১৯১০)। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় 'আনন্দময়ী' (১৯১০), 'বিশ্রাম' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), 'সপ্তাকুসুম' (১৯১৩), 'শেষদান' (১৯২৭)। তাঁর রচিত গানগুলি রয়েছে 'বাণী', 'কল্যাণী', 'আনন্দময়ী', 'অভয়া', ও 'শেষদান' কাব্যে। মুদ্রিত গানের সংখ্যা তিন শতাধিক।

বাংলার বরণীয় সফল চারজন প্রায় সমসাময়িক কবি ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বিশ্বতোমুখী ভাবনা, মননে অনন্য সাধারণ। অপর তিনজন কাব্যসংগীতের ধারায় কথা, সুর, ভাব ও ছন্দে যে বৈচিত্র্য এনেছেন তা হয়ে উঠেছে চিরকালের। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দ-অলঙ্কারের পারিপাট্যে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগে তাঁর গানকে অন্য মাত্রা দান করেছেন। অতুলপ্রসাদের গানে বাণীর বৈভব অপেক্ষা সুরের বৈচিত্র্য বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ ঘরানায় রয়েছে নুতনত্ব। তুলনাগতভাবে রজনীকান্তের গান সহজ ভাষায়, সহজ সুরে ভাবতন্ময়তা এনেছে। জীবনীকার শ্রদ্ধেয় নলিনীরঞ্জন পন্ডিত লিখেছেন,

> রজনীকান্তের কাব্যে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি নাই, দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা নাই, আছে প্রেম, ভক্তি, করুণা, ভালোবাসা, আছে বিশ্বস্রষ্টা, আছে উপনিষদের ঈশ্বর, গীতার ভগবান। তাঁর গানে যেন মেঠো সুরের বাঁশী বাজে। দেশের মানুষের অন্তরে সহজেই তা পৌঁছে গিয়েছিল, সাড়া জাগিয়েছিল বিপুল। বাংলার খুব কম কবিই একই সঙ্গে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের এমন হৃদয়স্পর্শ করতে পেরেছেন।

রজনীকান্তের গানের আলোচনায় অধ্যাত্ম-সাধনার কথা এসে পড়ে। সহজ এই সাধনায় সম্বল শুধু ঐকান্তিক ভক্তি আর বিশ্বাস। আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ কবি আশ্চর্য নির্ভরতা রেখে গিয়েছেন শেষ দিনটি পর্যন্ত। কবি রজনীকান্ত সম্পর্কে নলিনীরঞ্জনের চরম সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,

> তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেই তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিব, আবার তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে, সেই রজনীকান্ত সেন মানুষটিকে বুঝিতে পারিব।

প্রথম কন্যাটিকে হারিয়ে দুঃসহ আঘাতে জর্জরিত কবি। দ্বিতীয়া কন্যা শান্তিবালার (শান্তিলতা) আগমনে আনন্দোচ্ছ্বাস— অবিচ্ছিন্ন স্নেহ ধারায় সিক্ত তিনি। মধুর সুরে অভ্রান্তকণ্ঠে অমলিন প্রকাশ কিশোরী শান্তিবালার গান। নতুন গান রচনা করলে এই কন্যাই সর্বাগ্রে তা শিখতেন। শিক্ষা পেলেন ঐ গানের "মর্মবাণীর আত্মার উন্মোচনে"। ব্যবহারিক জীবনেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছেন তিনি কন্যাকে।

কোথাও রজনীকান্তের গানের উৎসব হবে; সঙ্গে যাবে কে? সঙ্গে গানে যোগ দেবে কে? দেবেন শান্তিবালা এবং সময়ে সময়ে তাঁর অন্যান্য ভাই বোনেরা। বহু বিদ্বজ্জন জ্ঞানীগুণীর আশীর্বাদে তাঁর কৈশোরকাল কেটেছে।

অকালে পিতৃবিয়োগে নেমে আসে দুর্যোগ। পুত্রেরা সংসারের হাল ধরেন। রসায়নবিদ সত্যরঞ্জন রায়ের সঙ্গে রজনীকান্তের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়।

সত্যরঞ্জন শান্তিবালার স্বচ্ছন্দ জীবন, স্বাধীনচেতা সন্তানদের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেননি। রজনীকান্ত কাটোয়ার গঙ্গার তীরে বেদান্তের বিশ্বময় পরমের বিরাজমানতার কথা জানিয়েছেন কন্যার শৈশবের প্রশ্নের উত্তরে। গঙ্গার সৌন্দর্য, জলের ছোট ছোট ঢেউ-এর উপর চাঁদের ঝিকিমিকি খেলা, হাওয়াতে নদীর পাড়ে পাতার আন্দোলন — মুগ্ধ রজনীকান্তকে প্রশ্ন করেন কন্যা

— আচ্ছা বাবা এসব কে তৈরি করেছে?

— এই নদী, এই নীল আকাশ, চাঁদ-তারা এতসব কে তৈরি করল?

— পিতার উত্তর : এই যা তোমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ, সবই ঈশ্বরের তৈরি। মাটি, আকাশ, বাতাস, জল যা কিছু আমরা দেখতে পাই সবই সেই একজনের তৈরি। তিনি ঈশ্বর কিন্তু তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। তিনি সর্বসময় সর্বত্রই আছেন। তোমাতেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সমস্ত লোকের মধ্যেই আছেন।

সন্ধ্যা আসন্ন — পিতা ফিরছেন (বলতে বলতে) — ওঁ পূর্ণমিদং পূর্ণমদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।— বুঝবার চেষ্টা করে দেখেছেন চোখের সামনে যা দেখছ তাও পূর্ণ, আবার পূর্ণ থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলে, পূর্ণ অর্থাৎ পরমব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন।

রজনীকান্ত গানে আত্মভোলা ছিলেন। পড়াশুনা করে ওকালতিতে উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। কিছু সাফল্যও পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মন বসেনি ঐ কাজে। নিজেই তিনি সে কথা বন্ধুর নিকট পত্রে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ - দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন অপেক্ষা কৈশোরোত্তীর্ণ রজনীকান্তের এই পর্বের জীবন ছিল কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে পরিপূর্ণ। পারিবারিক জীবনে অধ্যাবসায় ও ঈশ্বরের প্রতি সুগভীর প্রত্যয় তাঁর বাইরের অভাবকে সহজেই পরাস্ত করেছিল। রজনীকান্ত জীবনকে কোনও রঙিন আবরণের ভিতর দিয়ে দেখেননি, দেখেছেন সরাসরি। করুণাময়ের অনন্ত করুণা-মহিমায় কবি অভিভূত। কত হেলা-ফেলা করেছেন হাসি-আনন্দকে। 'মোহ-আলসে, বিলাসে-লালসে' কতদিন কেটেছে। তাই আজ 'পরান কম্পিত'। 'মানুষের সকল দুষ্কৃতিকে কবি নিজেই নীলকণ্ঠের মত ধারণ করেছেন'।

রজনীকান্ত সেনের গানগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে — (১) স্বদেশী গান (২) হাসির গান (৩) ভক্তিগীতি। প্রেম পর্যায়ের গান নগণ্য। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ ওঠে বাঙালির কণ্ঠে। গৃহে গৃহে পরিব্যাপ্ত হয় এই আন্দোলন। কবি গান রচনা করে এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। গানটি হল,

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।

এই গানটি সম্পর্কে নলিনীরঞ্জন লিখেছেন,

> এই গানের সঙ্গে সঙ্গে কবি রজনীকান্তের নাম বাংলার ঘরে ঘরে, বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাঙালীর বহুদিনের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। কবির এই গান অলস, আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল — তাহাকে শ্রেয় ও প্রেয়ের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল।

কবি 'রোজনামচায়' লিখেছেন,

> স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড়ো ভালবাসে। আমি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'-এর কবি বলে আমাকে ভালবাসে। (১৮ বৈশাখ ১৩১৭)

তিনদিন পর ২১ বৈশাখ ব্রজেন্দ্রনাথ বক্সীকে লেখেন,

> আমার মনে পড়ে, যেদিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে/বের করে এই গান গাইতে গাইতে গেল। সেদিনের কথা মনে করে আমার আজও চক্ষে জল আসে।

বঙ্গসাহিত্য সেবক শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই গানের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন,

> কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃ সূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যৎবাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে — নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু পুরুষের অশ্রু — বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোনও গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।

তাঁর 'ভারত কাব্য নিকুঞ্জে জাগো সুমঙ্গলময়ী মা', গানটি স্বরস্বতী বন্দনা হলেও স্বদেশ পর্যায়ের সুন্দর একটি গান। এই পর্যায়ের অপর গানটির মর্মকথাও প্রায় এক — 'তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত'। চাষী, তাঁতিকে আহ্বান ক'রে ক'সে লাঙল আর তাঁত চালাতে বলা হয়েছে দেশমাতার ঘরের জিনিসকে প্রাধান্য দিয়ে। এই পর্বের "আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাত ছোট" গানটিও সাড়া জাগায়, জনপ্রিয় হয়। এর মর্মোৎসারিত দুটি পংক্তি,

হারাসনে ভাইরে আর এমন সুদিন,
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো

'হয়নি কি ধারণা বুঝিতে পারনা ক্রমে উঠে দেশ উচ্ছে' (জাতীয় উন্নতিঃ বাণী) দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গগীতির অনুসরণে রচিত। দেশাত্মবোধক পর্যায়ের সংগীত সংখ্যায় অল্প হলেও স্বদেশী আন্দোলন ও ভাবধারায় কয়েকটি গান গুরুত্ব লাভ করে. জনপ্রিয়ও হয়। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'

গানটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যবাহী উজ্জ্বল একটি চিত্র ভৈরবীর করুণ সুরমাধুর্যে আর বাণীবৈভবে চিরকালের গান হয়ে আছে 'তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা' রচনাটি। এর নামকরণ করা হয় 'শক্তি-সঞ্চার'। গানটি সত্যই একদা স্বদেশী চেতনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর অপর কয়েকটি স্বদেশী সংগীত— (১) জয় জয় জনমভূমি, জননী (জন্মভূমি: বাণী), (২) শ্যামল শস্য ভরা (ভারতভূমি : বাণী)। আরও দুটি দেশাত্মবোধক গান পাওয়া যায়। সংকীর্তন সুরে রচিত 'আয় ছুটে ভাই হিন্দু-মুসলমান' (মিলন : বাণী) জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অপর একটি গান 'রে তাঁতি ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস' (তাঁতি-ভাই : বাণী), 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'-এর সমগোত্রীয়।

তাঁর ভক্তিগীতি পর্য্যায়ের গানে ভক্তি-বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা নিয়ে আত্মসমর্পণের এমন চিত্র বৈষ্ণবপদাবলীর 'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদে আর রামপ্রসাদের গানে একমাত্র মেলে। রজনীকান্তের এই পর্যায়ের গানগুলিকে ভক্তি ও সাধনার স্তর অনুযায়ী বিন্যস্ত ক'রে তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করলে তাঁর কবিত্ব তথা সাধনা সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট ধারণা সম্ভব। এই প্রবন্ধে স্বল্পায়তনে সাধারণ পরিচয়টুকুই বিধৃত হল। রজনীকান্তের সাধনার স্তরগুলি মোটামুটি এইরকম — অতৃপ্তি, অনুতাপ, পাপবোধ, সংশয়, আকুলতা, করুণা, অভিমান, বিশ্বাস, আত্মনিবেদন।

পার্থিব জীবনে লোভ-লালসা, কামনা, ঈশ্বর আরাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সাধক তাই কামনা-বাসনা কে কমাতে চায়। লোভশূন্য করে ভক্তের চাওয়াটি ঠিক হওয়া চাই। আমাদের চাওয়া ঠিক হয়না বলেই, ' কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা দিয়ে, দুদিনের মোহ ভেঙে চুরমার হয়'। এরপর ভক্তকে চাওয়া বন্ধ ক'রে পরমের নিকট ভার অর্পণ করতে হয়,

চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল সদা মম কুশলরত।
(আমি দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত)

দুঃখ-ব্যথা যন্ত্রণা যন্ত্রণাকাতর কবির প্রত্যয়টি দৃঢ়। তাই তিনি বলতে পারেন— তাঁর দয়াল ভালবাসেন বলেই কঠিন ব্যাধি দিয়ে তাঁকে সদা মনে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

রাজশাহিতে অবস্থানকালে ১৩০১ বা ১৩০২ সালে রজনীকান্তের সঙ্গে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সান্নিধ্য ঘটে। একটি সভায় তাঁর হাসির গানে মুগ্ধ হন। এরপর থেকে রজনীকান্ত কিছু হাসির গান রচনা করেন। তাঁর হাসির গানগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিশুদ্ধ হাস্যরসের অনুশীলন বা বোদ্ধার অভাব ঘটেছে বলে এই ধরনের গান আজ খুব কমই পরিবেশিত হয়। অসংগতি থেকেই হাসির জন্ম। সমকালীন ব্যক্তিজীবনাচরণের অসংগতি, ধর্মাশ্রিত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতি অবলম্বনে তাঁর হাসির গানগুলি রচিত। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কিছু

পরিবর্তন ঘটলেও তাঁর হাসির গানগুলির অধিকাংশ আজও প্রযোজ্য এবং উপভোগ্য। সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ থেকে কবি 'তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ' নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক জীবনের অসংগতিগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। হাকিম-উকিল, কেরানী, ভক্ত-ধার্মিক, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, কবি-বৈজ্ঞানিক বিবিধ শ্রেণির মানুষের আচরণে যেখানেই বিকৃতি বা নীতিহীনতা লক্ষ্য করেছেন কবি তাই নিয়ে পরিহাসের সুরে গান রচনা করেছেন। কবি গেয়েছেন — ধার্মিক বটে সেই, যে দিনরাত তিলক কাটে ; ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে। তাঁর 'বরের দর' ও 'বেহায়া বেয়াই' গানদুটি ব্যঙ্গ কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পণপ্রথার নিষ্ঠুর চিত্র,

সোনার চেন ঘড়ী, আইভরি ছড়ি
ডায়মন্ড কাটা সোনার বোতাম
দিও এক সেট, কতই বা দাম? (বরের দর)

বরের পিতা পাত্রের পরিচয় দেন,

যদি দিতেন একটি 'পাশ'
তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠল কম্পন ? (বরের দর)

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, 'রজনীকান্তের হাসির গানে কৌতুক হাসির সঙ্গে বেদনার অশ্রু মিশ্রিত'।

শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের সঙ্গে তুলনায় বলেছেন,

> তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি, দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান জলভরাক্রান্ত পূবের বাতাস।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রাজশাহিতে আগমনের পর কতকটা তাঁর অনুসরণে তিনি কিছু হাসির গান রচনা করেন।

কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আনন্দময়ী' (৫ অক্টোবর, ১৯১০) কাব্যগ্রন্থটিতে গিরিরাজ, রানি মেনকা ও কন্যা উমাকে নিয়ে কাহিনি বিবৃত হয়েছে। গৌরীর আগমন সংবাদে মেনকার ব্যাকুলতা, দশমী প্রভাতে শিবের সঙ্গে গৌরীর কৈলাস যাত্রা আর সেই সঙ্গে উমাকে সন্তান রূপে পাবার ব্যাকুলতাই তাঁর আগমনী-বিজয়া গানগুলির বর্ণনীয় বিষয়। ব্যক্তিমনের উচ্ছ্বাস বাৎসল্যে গার্হস্থ্য রসসিক্ত হয়ে অনুভব-বেদ্য হয়েছে। বাংলার ভক্তি সাধনার ধারাটি সুপ্রাচীন। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির মিলিত ধারায় ভক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। সরল ভক্তি-বিশ্বাসে ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভগবান এইরূপ ভক্তকে রক্ষা করেন — তাঁর সাধনা সফল হয়। সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ সংগীত। মন্ত্রের

শক্তির সমতুল্য এই সংগীত। বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী, বাউল, লোকসংগীত ধারায় দেহতত্ত্ব তথা সাধনার চরম ও পরম সিদ্ধি। ব্রহ্মসংগীত এবং রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের সংগীতসমূহ এই ধারায় অনুবর্তিত।

তৃতীয় সন্তান ভূপেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া। নিবিড় ঈশ্বর বিশ্বাসের জোড়ে তিনি এই নিদারুণ শোক জয় করে নেন। পুত্রশোকদগ্ধ-হৃদয়ে তিনি লেখেন গান – 'তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ...' । প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনীর মৃত্যুকালে কবির বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি বন্ধুকে নিয়ে বহির্বাটিতে আসেন এবং ওই গানটি গাইতে থাকেন।

তাঁর গান সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় বলেছেন — 'ঐকান্তিক অমৃত তৃষ্ণার গান'। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন,

> রজনীকান্তের মত মিষ্ট ও আকর্ষণীয় গান কখনো শুনিনি, দুঃখ ও হতাশার মধ্যে তাঁর গানই আমার সান্ত্বনা।

তাঁর তাৎক্ষণিক গীতরচনা শক্তি আমাদের বিস্মিত করে। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জামাতা বিয়োগে লেখা 'উদাস পরাণে কেন বিজনে বসিয়া', রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে 'প্রভাতে যাহারে হৃদমাঝারে', পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে 'দীন নির্ঝর ক্ষীণ জলধারা' ও 'সাঁঝে এ কি হয় কোলাহল', পুঠিয়া রাজার বিবাহ উপলক্ষে 'শারদ-শশি-রুচির-বরণ'। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন ভবনে প্রবেশ উপলক্ষে 'লক্ষরক্ষ সৌরজগৎ' ও 'স্তূপীকৃত গগনরহিত' গানগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল রাজশাহি লাইব্রেরির এক সভায় যাবার জন্য অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের বাড়িতে রজনীকান্ত এলে তিনি তাঁকে একটি গান রচনা করতে বলেন। আশ্চর্যের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ একটি গান রচিত হল সভায় গাওয়ার জন্য। বিখ্যাত সেই গানটি হল, 'তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা'

রজনীকান্তের গানে তত্ত্ব থাকলেও বিশ্বাস ও ভক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভক্তের বিশ্বাস অপরিমিত। তিনি গেয়েছেন,

> পাতকী বলিয়ে কি গো / পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
> তবে কেন পাপী তাপী / এত আশা করে রয় ? (কল্যাণী)

ভক্তের আত্মবিশ্বাসে যুক্তিতর্ক ভেসে যায়,

> কেন বঞ্চিত হব চরণে
> আমি কত আশা করে বসে আছি,
> পাব জীবনে, না হয় মরণে। (কল্যাণী)

অসীম ব্যাকুলতার চিত্র তাঁর বেশকিছু গানে লক্ষ্য করা যায়। 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে' এবং 'ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু' গানদুটিতে দেখি অন্তরের

মালিন্য আবরণটি উন্মোচন করে দেবার গভীর আকুলতা। জাগতিক চাওয়া-পাওয়া শেষ না হলে আসল বস্তুটি চাওয়ার দিকে মন অগ্রসর হতে পারে না। তাই ব্যথিত ভক্ত-অন্তরের প্রার্থনা ,

(ওরা) চাহিতে জানে না, দয়াময়।
চাহে ধন জন আয়ু, আরোগ্য, বিজয়।

সময় থাকতে আমাদের চেতনা জাগে না। সেইজন্য ভক্তকে জাগ্রত করার প্রার্থনা ধ্বনিত হয় কবিকণ্ঠে ,

জাগাও পথিকে / ও যে ঘুমে অচেতন।
বেলা যায় / বহুদূরে পান্থ নিকেতন (অভয়া)

কবির জীবনের কঠিন অধ্যায় তাঁর শেষ আট মাসের সাধনা। কবি তখন রোগক্ষত, জীর্ণদেহ, মৃত্যুবরণের প্রস্তুতিতে প্রশান্ত। আসন্ন মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি যশ, অর্থ, মান, স্বাস্থ্য সকলই 'দয়াল'- এর নিকট সমর্পণ করেছেন। বিধাতার বরমাল্য নিঃসন্দেহে হয়েছে লব্ধ। রজনীকান্তের জীবন ও কাব্য একযোগে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এই সময়ের কয়েকটি গানে/ টুকরো টুকরো রোজনামচায় আন্তরিকতা ও ভাবের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি লিখেছেন,

> সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার হলেও তো পুত্র। আমাকে কি ফেলতে পারে? তাই এই শাস্তি, বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়লা-মাটি আঘাতের চোটে পড়ে গিয়ে খাঁটি জিনিসটি হব, তখন আমাকে কোলে নেবে।

রোগযন্ত্রণা অতিক্রম ক'রে ভগবদ্‌বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর কয়েকটি গান,

১. আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করিছে গর্ব করিতে চুর,
যশ ও অর্থ মান ও স্বাস্থ্য সকলি করিছে দূর।

২. আমি রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করিব?
'ও গো খুলে দাও' বলে আর কত পায়ে ধরিব ?

৩. আমার দয়াল ওই বসে আছে নিরজনে।
আমারে দিওনা বাধা, ভেসে যাই একমনে।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০-এ গলক্ষতের শল্য চিকিৎসার তৃতীয় দিবসে কবি 'কটেজে' আনীত হন। মেডিকেল কলেজ-সংলগ্ন প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ হাসপাতালের দক্ষিণে ইডেন হাসপাতাল রোডের উপর নির্মিত তিনটি সুদৃশ্য বাড়ি। ১২ নং কটেজে কবির থাকার ব্যবস্থা হয়। প্রায় আট মাস রোগভোগের পর কবির তিরোধান ঘটে।

মরমী সাধক মৃত্যুপথযাত্রী রজনীকান্তকে দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে পত্রটি প্রেরণ করেন, তার মধ্যে কবির কাব্যপরিচয় ও কবিমানসের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ রায় এই পত্রটিকে 'রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা' বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। ... শরীর হার মানিয়াছে কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই —কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই — পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিস্যাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই' — কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি তত বেশি করিয়া জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।

এই মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া ঊর্ধ্বে ধরিবে কে ? (১ আষাঢ়, ১৩১৭)

সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন — আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন- সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।

রজনীকান্তের পাঠানো গানটি মতান্তরে,

আমায় সকল রকমে কাঙাল করিছে গর্ব করিতে চুর
তাই যশ ও অর্থ মান ও স্বাস্থ্য সকলি করিছে দূর।

দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবির প্রশান্ত, ধীর, শান্ত মূর্তির ঐ দৃশ্য ঈশ্বরে সুগভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। যত যন্ত্রণাই হোক না, তা যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা — এ বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ়। আপন নির্মল পবিত্র জীবনের স্মৃতির উভয় নির্ভরতা ছিল বলেই তাঁর পক্ষে ঐরূপ ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে। স্বদেশী-সংগীত, হাসির গান ও ভক্তিসংগীতের কবি তিনি। কিন্তু অন্তিম কয়েকটি মাস প্রমাণ করেছে কবির শক্তি নিহিত ছিল ভক্তি-সংগীতের ঈশ্বরের অস্তিত্বের মূলে। চিরদিন কবির নিকট বিশ্বদৃশ্য যত 'অস্তি' প্রচার করেছে। হাসপাতালে আসার দিনটিতে রচিত গানটিতে চরম আঘাতে/পরম দয়ালের মহিমায়-অভিভূত ভক্তকবি,

আমায় সকল রকমে কাঙাল করিছে
গর্ব করিতে চুর,
যশ ও অর্থ মান ও স্বাস্থ্য, / সকলি করিছে দূর।
... ...
ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,

বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব করিতে চুর।

কবি ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ও ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতার গানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশ কিছু গান রচনা করেন। সেই গানগুলি ব্রাহ্মসমাজে গীত হয়েছে। কবি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানেও সংগীত পরিবেশন করেছেন।

'সারল্য ও আবেগময়তা কান্তকবির গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।' জনৈক সংগীতজ্ঞের মন্তব্য — 'এমন সমাহিত নম্রমধুর সুরকলা বাংলাগানে একমাত্র রজনীকান্তের মধ্যেই পাওয়া যায়।' তাঁর সংগীত গুরু তারকেশ্বর চক্রবর্তীর নিকট তিনি রাগাশ্রিত গানের চর্চা করেছেন। রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কবির গভীর জ্ঞান থাকলেও তাঁর গানে রাগের প্রয়োগে সারল্যই লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তিজীবনের ন্যায় সুর-রচনায়ও তাঁর সহজ, সরল ব্যক্তিত্ব সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্ত সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের ভাবধারা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল কবিত্বের তথা সুরের পরিমন্ডলে থেকেও তাঁর গান কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পেরেছে। আজও তাই রজনীকান্তের গান, সাধনা ও ভক্তির ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত। রামপ্রসাদের উত্তরসূরী রূপে রজনীকান্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সরল ভাষায় প্রাণময়। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের ভক্তিমূলক সংগীতের স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে। তবুও রজনীকান্তের এই ধারার গানের ভাবপ্রকাশের যেন একটি পরিশীলিত গায়নশৈলী আপনিই গড়ে উঠেছে, যার ফলে একটু লক্ষ্য করলেই রজনীকান্তের গানকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। দুর্লভ সংগীত রচনা করেছেন তিনি।

সম্প্রতি রজনীকান্তের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে শ্রদ্ধা সহকারে। আনন্দের কথা কবির দৌহিত্র প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও শিক্ষক প্রায় শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও রজনীকান্তের গানের যথাযথ অনুশীলনে প্রভূত প্রযত্নে ব্রতী। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ সাধু, নীলা বসুসহ বেশ কিছু প্রখ্যাত শিল্পী তাঁর গান বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি সবচেয়ে সুন্দর ও যথাযথ অনুশীলনে শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় যাঁকে বেছে নিয়েছেন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী শ্রীমতী অর্চনা ভৌমিক। তিনিও বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করেছেন যারা এগানের ধারাকে সাধ্যমত বিশুদ্ধভাবে অনুশীলনে অগ্রণী। 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাডেমি' থেকে শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ের সম্পাদনায় 'কান্ত-কবির গান' শীর্ষক দুটি স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এরপর এ কাজ আর অগ্রসর হয় নি। আনন্দের কথা বেতার ও দূরদর্শনে এখন নিয়মিতভাবেই কান্ত-কবির গান প্রচারিত হচ্ছে। বেশ কিছু সি.ডিও প্রকাশিত হয়েছে। বাণী, সুর ও সাধনার সার্থক সমন্বিত মর্মস্পর্শী গানের কবি, গীতিকার ও সুরকার রজনীকান্ত বাংলার সংগীত জগতের চিরদিনের প্রাণের মানুষরূপে পূজিত হবেন।